আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসাশাস্ত্র

যে শাস্ত্র পাঠ করলে আয়ু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা যায় সেই শাস্ত্রকে বলা হয় আয়ুর্বেদ। কোন ব্যক্তি স্বল্পায়ু হবে না দীর্ঘায়ু হবে, সে স্বাস্থ্যবান হবে না রোগযুক্ত আয়ু নিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে—এ সকল বিষয় অবগত হওয়া যায় আয়ুর্বেদ থেকে। জীবনের লক্ষ্য যাই হোক না কেন, সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার মূলে আছে সুস্বাস্থ্য ও নীরোগ শরীর। স্বাস্থ্যহীনতা ও রুগ্নতা জীবনসংগ্রামে ব্যর্থতার মূল কারণ। চরকসংহিতায় বলা হয়েছে—

"ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্তারং শ্রেয়সো জীবিতস্য চ।।"[১]

আয়ুর্বেদের প্রয়োজন

"শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্"—মানুষের শরীরমাত্রেই ব্যাধির আকর। মানুষ মাত্রেই স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম কমবেশী লঙঘন করে থাকে। তাছাড়া মানুষকে কাল, ঋতু ও প্রকৃতির খেয়াল সহ্য ক'রে নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এর ফলে শরীরনির্মাণকারী ধাতুসমূহ বিকৃত হয়। শরীরের উপর কোন অত্যাচার না করা সত্ত্বেও তাই মানুষ নানাপ্রকার ব্যাধিতে পীড়িত হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত নিয়ম পালন করলেও ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। আয়ুর্বেদশাস্ত্রেই নিহিত আছে ধাতুসমূহকে সাম্যাবস্থায় আনার নানান উপদেশ। বিভিন্ন রোগের কারণ এবং সেগুলির প্রতিকারের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ও নির্দিষ্ট হয়েছে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে। কাজেই শরীরগঠনকারী ধাতুসমূহকে সাম্যাবস্থায় এনে বিভিন্ন ব্যাধির প্রকোপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার জন্যই আয়ুর্বেদশাস্ত্র অপরিহার্য্য। তাই চরকসংহিতায় বলা হয়েছে—

"....কার্যং ধাতুসাম্যমিহোচ্যতে।
ধাতুসাম্যক্রিয়া চোক্তা তন্ত্রস্যাস্য প্রয়োজনম্।।"[২]

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উৎপত্তি

এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করার পূর্বে 'ব্রহ্মসংহিতা' নামে একলক্ষ শ্লোকে নিবদ্ধ এবং এক সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। পরে তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবকুলকে অল্পায়ু ও স্বল্পধী দেখে সেই বৃহদাকার ব্রহ্মসংহিতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার কাছ থেকে এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শিক্ষালাভ করেন বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য এবং দক্ষ প্রজাপতি। দক্ষপ্রজাপতির কাছ থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়,

১. চরকসংহিতা, সূত্রস্থান—১।১৫।
২. ঐ —১।৫৫

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র এই বিশেষ শাস্ত্র অধিগত হন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার দ্বারা বিভক্ত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গ বা তন্ত্র হল— (১) শল্য, (২) শালাক্য, (৩) কায়চিকিৎসা, (৪) ভূতবিদ্যা, (৫) কৌমার ভৃত্য, (৬) অগদ, (৭) রসায়ন এবং (৮) বাজীকরণ।

শল্যতন্ত্রে আছে কাষ্ঠ, পাষাণ, লৌহ, অস্থি, ধূলি প্রভৃতি শরীরে প্রবেশ করলে তা নির্গত করার বিভিন্ন উপায়ের বিস্তৃত বিবরণ। কর্ণ, চক্ষু, মুখ, নাসিকাজনিত রোগসমূহের নিরাময়ের ব্যবস্থা উপদিষ্ট হয়েছে শালাক্যতন্ত্রে। কায়চিকিৎসাতন্ত্রে বিবিধ অঙ্গাশ্রিত ব্যাধির, বিশেষতঃ জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, উন্মাদ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হয়েছে। গ্রহকবলিত মানুষের চিকিৎসার বিস্তৃত বিবরণ অর্থাৎ গ্রহশান্তি, হোম, যাগযজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি উপদিষ্ট হয়েছে ভূতবিদ্যায়। কৌমারভৃত্য নামক তন্ত্রটি শিশুচিকিৎসার আলোচনায় সমৃদ্ধ। অগদতন্ত্রে আছে সর্প, কীট, বৃশ্চিক প্রভৃতির বিষ সম্পর্কে জ্ঞান এবং সর্পাদির দংশনজনিত ব্যাধি প্রশমনের উপায়। বিভিন্ন রোগবিনাশক ভেষজের বিবরণ এবং আয়ু, মেধা প্রভৃতি বর্ধনের উপায় লিপিবদ্ধ আছে রসায়নতন্ত্রে। বাজীকরণতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল বিভিন্ন শুক্রের আপ্যায়ন, উপচয় এবং রিরংসা জননের উপায়। দুস্তর সমুদ্রের ন্যায় সুবিশাল এই আয়ুর্বেদশাস্ত্র কোন একজন মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাই এক একটি তন্ত্রকে অবলম্বন করে চিকিৎসাশাস্ত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। আয়ুর্বেদের এই সম্প্রদায়গুলি হল— (১) আত্রেয় সম্প্রদায়, (২) ধন্বন্তরি সম্প্রদায়, (৩) শালাক্য সম্প্রদায়, (৪) ভূতবিদ্যা তান্ত্রিক সম্প্রদায়, (৫) কৌমারভৃত্য সম্প্রদায়, (৬) অগদ তান্ত্রিক সম্প্রদায়, (৭) রসায়ন তান্ত্রিক সম্প্রদায় এবং (৮) বাজীকরণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়।

ভারতে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

ভারতে আয়ুর্বেদের বীজ উপ্ত হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। ঋগ্বেদসংহিতার রুদ্রসূক্তে বলা হয়েছে—

"ত্বাদত্তেভি রুদ্র শন্তমেভিঃ শতং হিমা অশীয় ভেষজেভিঃ।
ব্যস্মদ্ দ্বেষো বিতরং ব্যংহো ব্যমীবাশ্চাতয়স্বা বিষূচীঃ।।" (২।৩৩।২)

অর্থাৎ হে রুদ্র, আমরা যেন তোমার দেওয়া সুখকর ওষধিদ্বারা শতবর্ষ জীবিত থাকতে পারি। তুমি আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর, আমাদের পাপ নির্মূল কর এবং শরীরের সকল ব্যাধি দূর কর।

অথর্ববেদের ভৈষজ্যমন্ত্র, আয়ুষ্যমন্ত্র, পৌষ্টিক মন্ত্র প্রভৃতির মধ্যে নিহিত আছে আয়ুর্বেদের উৎস। অথর্ববেদের ঋষিরা রোগব্যাধির নেপথ্যে বিশেষ অসুরের কল্পনা করে মন্ত্রশক্তির সাহায্যে তাকে দূর করতে চেয়েছেন। তাই জ্বরাসুরের বিনাশের জন্য

ঋষিকণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে—

"অয়ং যো বিশ্বান্ হরিতান্ কৃণোষ্যুচ্ছোচয়ন্নগ্নিরিব বা ভিদুধ্বন্।
অধাহি তক্‌মন্নরসো হি ভূয়া অধান্যঙ্ঙধরাং বা পরেহি।।[১]"

অশ্মরীরোগ, শূলবেদনা, উদরী, চক্ষুরোগ, বাত, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নিরাময়ের মন্ত্র অথর্ববেদে আছে। দীর্ঘ নীরোগ জীবন এবং সুন্দর স্বাস্থ্য লাভের জন্য আয়ুষ্য মন্ত্রের প্রয়োগ করা হত। এই ধরণের একটি মন্ত্রে দ্যুলোক ও পৃথিবীলোকের মত প্রাণকে অভয় দান করে বলা হয়েছে—

"যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ।।[২]"

বৈদিকসাহিত্য থেকে জানা যায় যে, শারীরবিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বৈদিক ঋষিদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। আয়ুর্বেদশাস্ত্রকে বেদের অন্যতম সহায়ক বিদ্যারূপে গণ্য করা হত। শল্যচিকিৎসা সম্পর্কে প্রাচীন ঋষিদের জ্ঞান ছিল লক্ষ্য করার মত। ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে যে, দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় যুদ্ধে ছিন্ন বিশ্‌পলার পদদ্বয়ে লৌহময় জঙ্ঘা পরিয়ে দিয়েছিলেন—"সদ্যো জঙ্ঘামায়সীং বিশ্‌পলায়ৈ ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম্।" বৈদিক যুগে বন্ধ্যাত্বকরণ এবং মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসা বিদ্যারও বিশেষ চর্চা হত। তাই V. Varadachari মন্তব্য করেছেন—"Surgery was practised including major operations like amputation, laporotomy and trephining of the skull."[৪] প্রাচীন সাহিত্যে এমন কিছু ঋষির নাম পাওয়া যায় যাঁরা চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ দান করতেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মহর্ষি আত্রেয়। আত্রেয়কেই এই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্তকরূপে গণ্য করা হয়।

মহর্ষি আত্রেয়

মহর্ষি আত্রেয় ভরদ্বাজের কাছ থেকে কায়চিকিৎসা বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করে তা নিজ শিষ্যদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনিই আত্রেয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। চরকসংহিতায় তিনজন আত্রেয়ের নাম উল্লিখিত হয়েছে—(১) অত্রিপুত্র আত্রেয়, (২) কৃষ্ণাত্রেয় এবং (৩) ভিক্ষু আত্রেয়। অত্রিপুত্র আত্রেয়ই চরক সংহিতার প্রধান বক্তা। ইনি অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি—এই ছয়জন তন্ত্রকারের গুরু। কৃষ্ণাত্রেয় ছিলেন শালাক্য তান্ত্রিক গ্রন্থকার। চরকসংহিতার বিভিন্ন টীকাকার কৃষ্ণাত্রেয় থেকে পৃথকভাবে বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করেছেন। ভিক্ষু আত্রেয় অত্রিসংহিতার প্রণেতা বৌদ্ধ চিকিৎসক। ইনি বিম্বিসারের

১. অথর্ববেদ সংহিতা—৫।২২।২
২. ঐ —২।১৫।১
৩ ঋগ্বেদ—১।১১৬।১৫
৪. V. Varadachari : HSL, P–205

চিকিৎসক এবং তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক **জীবক এঁরই তত্ত্বাবধানে** আয়ুর্বেদীয় শালাক্য ও শিশুরোগ চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন।

আয়ুর্বেদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গ বা তন্ত্রকে ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে আটটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। প্রতিটি সম্প্রদায়ে এমন কিছু কৃতবিদ্য চিকিৎসক ছিলেন যাঁদের রচিত আয়ুর্বেদ বিষয়ক গ্রন্থ প্রাচীন ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। প্রতিথযশা সেই আয়ুর্বেদবেত্তাদের রচিত কিছু কালাতিশায়ী গ্রন্থের প্রতি আলোকপাত করলে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ইতিহাস কিছুটা স্পষ্ট হবে।

চরকসংহিতা

বর্তমানে যে আকারে 'চরকসংহিতা' গ্রন্থটি পাওয়া যায় তার প্রকৃত রচয়িতা হলেন মহর্ষি আত্রেয়ের অন্যতম শিষ্য অগ্নিবেশ। অর্থবেদের পর থেকে উপনিষদ যুগের শেষ পর্যন্ত 'অগ্নিবেশতন্ত্র'-ই আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষার প্রধান গ্রন্থ ছিল। কালের করাল গ্রাসে এবং দীর্ঘকাল উপযুক্ত চর্চার অভাবে অগ্নিবেশসংহিতার বহুলাংশ বিনষ্ট হয়। পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্বেদ চর্চার অভাবে সমাজে অকাল মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির প্রকোপ দেখে অহিপতি ভগবান শেষনাগ চরকরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে লুপ্তপ্রায় অগ্নিবেশতন্ত্রের সংস্কার সাধন করেন। চরকের নামানুসারে সেই গ্রন্থ 'চরকসংহিতা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, উপলভ্যমান চরকসংহিতা কোন একক ব্যক্তির রচনা নয়। এই অনুমান অমূলক নয়। কারণ চরকসংহিতার শেষে উল্লিখিত হয়েছে যে, এই গ্রন্থটি অগ্নিবেশ কর্তৃক রচিত, চরক কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত এবং মহাত্মা দৃঢ়বলের দ্বারা পরিপূরিত[১]। চরকসংহিতার চিকিৎসাস্থানের ত্রিংশ অধ্যায়েও বলা হয়েছে—

"অস্মিন্ সপ্তদশাধ্যায়াঃ কল্পাঃ সিদ্ধ্য় এব চ।
নাসাদ্যন্তে অগ্নিবেশস্য তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে।।
তানেতান্ কাপিলবলো শেষান্ দৃঢ়বলোঽকরোৎ।
তন্ত্রস্যাস্য যথার্থস্য পূরণার্থং যথাতথম্।।"

অর্থাৎ চরকের দ্বারা সংস্কৃত অগ্নিবেশসংহিতার চিকিৎসাস্থানের শেষ সপ্তদশ অধ্যায় এবং সম্পূর্ণ কল্পস্থান ও সিদ্ধি স্থান বিনষ্ট হওয়ায় পরবর্তীকালে কপিলের পুত্র দৃঢ়বলের দ্বারা তা পরিপূরিত হয়। কাজেই চরকসংহিতার রচয়িতা অগ্নিবেশ,

১. "ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতেপ্রাপ্তে দৃঢ়বলসংপূরিতে সিদ্ধি স্থানে....।"

প্রতিসংস্কর্তা চরক এবং পরিপূরক দৃঢ়বল।

চিকিৎসাশাস্ত্র হিসাবে চরকসংহিতা আজও সর্ববৃহৎ এবং সর্বতথ্যসমন্বিত। গ্রন্থটি আটটি স্থানে বিভক্ত—(১) সূত্রস্থান, (২) নিদানস্থান, (৩) বিমানস্থান, (৪) শারীরস্থান, (৫) ইন্দ্রিয়স্থান, (৬) চিকিৎসিতস্থান, (৭) কল্পস্থান ও (৮) সিদ্ধি স্থান। এগুলির প্রতিটি আবার বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত। মোট অধ্যায়ের সংখ্যা এক শত কুড়ি। আয়ুর্বেদের লক্ষণ ও প্রয়োজন, শারীরিক ও মানসিক দোষসমূহের বিবরণ, চিকিৎসার্হ বৈদ্যের লক্ষণ, শারীরিক স্বাভাবিক ক্রিয়া-দমনে বিভিন্ন ব্যাধির উৎপত্তির বিবরণ সূত্রস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। নিদানস্থানে আছে ব্যাধির ভেদ, পর্যায় ও বিভিন্ন ব্যাধির লক্ষণ। কটু, অম্লাদি রসের কার্যকারিতা, বিভিন্ন রোগের মূলে তাদের ভূমিকার কথা আলোচিত হয়েছে বিমানস্থানে। শারীরস্থানটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল—ধাতুভেদে পুরুষের ভেদ, শরীরের গঠনানুসারে রোগের ভেদ নির্ণয়। ইন্দ্রিয়স্থানে আছে ব্যাধির উদ্ভবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভূমিকার বিশদ আলোচনা। চরকসংহিতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল চিকিৎসাস্থান নামক অংশটি। এখানে বিভিন্ন রোগের কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় আলোচিত হয়েছে। বহু দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন রাজযক্ষা, কর্কট প্রভৃতি চিকিৎসার পদ্ধতিও এখানে নির্দিষ্ট হয়েছে। কল্পস্থানে আছে দ্রব্যগুণ বিচার ও বিভিন্ন গাছ-গাছড়া থেকে ঔষধ প্রস্তুতের বিবরণ। বিভিন্ন ব্যাধি থেকে সত্বর আরোগ্য লাভের উপায়, ঔষধের সেব্যাসেব্য বিচার প্রভৃতি নির্দিষ্ট হয়েছে সিদ্ধি স্থান নামক অংশে।

নীরোগ দীর্ঘায়ু লাভের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন তার সবই চরকসংহিতায় আলোচিত হয়েছে। হিমালয়ের মত বিশাল ও মহাসমুদ্রের মত দুরধিগম্য এই গ্রন্থটিকে সর্ববিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার বললেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু চিকিৎসাগ্রন্থ হিসাবে নয়, মানুষের সার্বিক মানসিক উন্নতির জন্য যা কিছু জ্ঞানের প্রয়োজন তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ হয়েছে চরকসংহিতায়। ব্যাধিসমূহের উৎপত্তির আলোচনা প্রসঙ্গে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে যে, মানুষের সর্ববিধ রোগের মূলে আছে বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রভাব—"বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চোক্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ।"[১] চরক মানুষের সকল ব্যাধিকে আগ্নেয়, সৌম্য ও বায়ব্য ভেদে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর পূর্বসূরীরা যে রাজস ও তামসভেদে ব্যাধিসমূহকে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন তাও তিনি উল্লেখ করেছেন—"অতস্ত্রিবিধা ব্যাধয়ঃ প্রাদুর্ভবন্তি—আগ্নেয়া, সৌম্যা বায়ব্যাশ্চ; দ্বিবিধাশ্চাপরে রাজসাঃ তামসাশ্চ।"[২] এখানে রাজযক্ষাকে একাদশ ব্যাধির সম্মেলন বলা হয়েছে।[৩] চরকসংহিতার পরিপূরক মহাত্মা দৃঢ়বল উপসংহারে মন্তব্য করেছেন—

---

১. চরক সং. সূত্রস্থান ১।৫৭

২. চরক সং. নিদানস্থান ১।৪.

৩. চরক সং. চিকিৎসাস্থান—৮।৪৩-৪৬.

"চিকিৎসা বহ্নিবেশস্য স্বস্থাতুরহিতং প্রতি।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।"[১]

অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তি ও রোগীর চিকিৎসা বিষয়ে অগ্নিবেশ চরকসংহিতায় যা বলেছেন তা অপরাপর চিকিৎসাশাস্ত্রে থাকতে পারে, কিন্তু চরকসংহিতায় যা নেই তা অন্য কোথাও নেই।

চরকসংহিতা যে এককালে বহুল সমাদৃত হয়েছিল তার প্রমাণ এই গ্রন্থের উপর রচিত অসংখ্য টীকা। চরকসংহিতার টীকাকারদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন— চক্রপাণি দত্ত, শিবদাস, গঙ্গাধর, ঈশ্বর সেন, শ্রীকণ্ঠ, ঈশানদেব, জিনদাস, ব্রহ্মদেব, ইন্দুকর প্রভৃতি।

সুশ্রুতসংহিতা

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ইতিহাসে চরকসংহিতার পরেই সুশ্রুতসংহিতার স্থান। ধন্বন্তরির দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম সুশ্রুতের নামানুসারে এই গ্রন্থ সুশ্রুতসংহিতা নামে পরিচিত। বর্তমানে সুশ্রুতসংহিতা নামে যে গ্রন্থ পাওয়া যায় তা সুশ্রুতের রচনা নয়। কারণ গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার "নমো ব্রহ্মপ্রজাপত্যশ্বিবলভিদ্ধন্বন্তরিসুশ্রুতপ্রভৃতিভ্যঃ"—এরূপ বাক্যদ্বারা সুশ্রুতের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ নমস্কার জ্ঞাপন করেছেন। সুশ্রুত নিজেই যদি সংহিতাকার হতেন তবে তিনি নিজে নিজেকে নমস্কার করতেন না। এরদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুশ্রুত ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির দ্বারা পরবর্তীকালে এই সংহিতা সঙ্কলিত হয়েছে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের গবেষকরা মনে করেন যে, সুশ্রুত-প্রণীত মূল 'সুশ্রুততন্ত্র' গ্রন্থটি কালবশে বিনষ্ট হওয়ায় নাগার্জুন তার সংস্কার সাধন করেন। নাগার্জুনের দ্বারা সংস্কৃত সেই গ্রন্থটিই সুশ্রুত সংহিতা।

সুশ্রুত বিশ্বামিত্রের পুত্র। মর্ত্যলোকে মানবদের ব্যাধিপীড়িত দেখে ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে সমস্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষা দেন এবং কাশীধামে দিবোদাস নামক ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করতে আদেশ দেন। তদনুসারে ধন্বন্তরী কাশীতে দিবোদাসরূপে জন্মগ্রহণ করলে বিশ্বামিত্র ধ্যানবলে তা জানতে পারেন এবং নিজপুত্র সুশ্রুতকে তাঁর কাছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়নের উপদেশ দেন। পিতার নির্দেশে সুশ্রুত দিবোদাসের কাছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে আয়ুর্বেদ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীকালে সুশ্রুতের রচনা নাগার্জুনের হাতে সংস্কৃত ও পরিমার্জিত হয়ে 'সুশ্রুতসংহিতা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। খ্রীষ্টজন্মের প্রারম্ভকালকে ঐতিহাসিকেরা নাগার্জুনের আবির্ভাবকাল রূপে চিহ্নিত করেছেন। তারও সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে 'সৌশ্রুততন্ত্র' রচিত হয়েছিল—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়।

নাগার্জুনের দ্বারা সংস্কৃত ও পরিমার্জিত সুশ্রুতসংহিতার প্রথমেই আছে সূত্রস্থান,

---

১. চরক সং. সিদ্ধিস্থান—১২।৫৩-৫৪

যার অধ্যায় সংখ্যা ৪৬। নিদানস্থান ষোলটি অধ্যায়ে বিভক্ত। শরীরস্থানের অধ্যায় সংখ্যা দশ। এই সংহিতার চিকিৎসিত স্থানটি আকারে বৃহৎ, ৪০টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার বিবরণে সমৃদ্ধ। কল্পস্থানে আছে আটটি অধ্যায়। গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে ৬৬ অধ্যায়ে বিভক্ত উত্তরতন্ত্র। সুশ্রুতসংহিতার বিষয়সন্নিবেশ ব্যবস্থা সুসমৃদ্ধ এবং রচনারীতি অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। বিষপ্রয়োগের চিকিৎসায় বলা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে সর্পদষ্ট স্থানের চার আঙ্গুল উপরে চর্ম, বল্কল বা বস্ত্রদ্বারা বন্ধন বিধেয়—

"দংশস্যোপরি বধ্নীয়াদরিষ্টাশ্চ তুরঙ্গুলে।
প্লেতিচর্মান্তবল্কানাং মৃদুনান্যতমেন চ।।"[১]

রক্তমোক্ষণকেই সর্পদংশনের সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা বলা হয়েছে—"ফণিনাং বিষবেগে তু প্রথমে শোণিতং হরেৎ[২]।" পরে ঔষধ প্রয়োগ বিধেয়।

সুশ্রুত শল্যচিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সুশ্রুতসংহিতায় শল্যতন্ত্রকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে (১) ছেদন (amputation), (২) ভেদন (accession), (৩) লেখন (Scraping), (৪) ব্রধ্যন (Probing), (৫) আহরণ (extraction), (৬) বিস্রবণ (drainage), এবং (৭) সীবন (suturing)। শবব্যবচ্ছেদ পূর্বক অঙ্গবিনিশ্চয়ের উপদেশ, ব্যবচ্ছেদ কার্যে শল্যচিকিৎসকের কর্তব্য, শস্ত্রোপচারের পূর্ব, মধ্য ও পরবর্তী অবস্থা; অশ্মরী, অর্শ, অস্থিভঙ্গ প্রভৃতির অস্ত্রোপচার, একস্থানের মাংস নিয়ে শরীরের অন্যত্র সংযোজন, মস্তিষ্কের শল্য চিকিৎসা প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, সুশ্রুতসংহিতার সমসাময়িক কালে শস্ত্রচিকিৎসা উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল। সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্র মূলতঃ তৎকালে প্রচলিত সমুদয় শাস্ত্রের সারসঙ্কলন।

চরকসংহিতার ন্যায় সুশ্রুতসংহিতাও তৎকালীন ভিষগ্‌বর্গের দ্বারা বহুল সমাদৃত হয়েছিল। ভাষার সহজবোধ্যতা ও বিষয়োপস্থাপন পদ্ধতি গ্রন্থটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। সুশ্রুতসংহিতার টীকাকারগণের মধ্যে জেজ্জট, শ্রীমাধব, চক্রপাণি, ডল্বণ, কৌপালিক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভেলসংহিতা

মহর্ষি আত্রেয়ের ছয়জন শিষ্যের মধ্যে ভেল অন্যতম। তাঁর রচিত 'ভেলতন্ত্র' বা 'ভেলসংহিতা' চিকিৎসাশাস্ত্রের অপর এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতার সঙ্গে এই গ্রন্থের গঠনগত সাদৃশ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই সংহিতাটি পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অনুসরণে রচিত। সূত্রস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান, শারীরস্থান, ইন্দ্রিয়স্থান, চিকিৎসাস্থান, সিদ্ধি স্থান ও কল্পস্থান—এই আটটি

১. সুশ্রুতসং, কল্পস্থান—৫।২.
২. ঐ — ৫।৩.

অংশে এবং ১১৩ অধ্যায়ে গ্রন্থটি বিভক্ত। আলোচ্য বিষয় চরকসংহিতার অনুরূপ হলেও এর উপস্থাপন রীতি প্রাঞ্জল। বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস প্রভৃতি এই গ্রন্থ থেকে অনেক অংশ উদ্ধৃত করেছেন। বাগ্‌ভট এই সংহিতার অনেক প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছেন।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহ, অষ্টাঙ্গহৃদয় ও রসরত্নসমুচ্চয়

আত্রেয় সম্প্রদায়ের অপর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাগ্‌ভট তিনটি প্রধান আয়ুর্বেদ বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থ তিনটি হল—অষ্টাঙ্গসংগ্রহ, অষ্টাঙ্গহৃদয় ও রসরত্নসমুচ্চয়। বাগ্‌ভটের পিতার নাম সিংহগুপ্ত। তিনি সিন্ধুদেশের অধিবাসী ছিলেন। বাগ্‌ভটের আবির্ভাবকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বৈমত্য আছে। হারীতসংহিতায় বাগভটকে যুধিষ্ঠিরের রাজবৈদ্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ চরক ও সুশ্রুতের পরে এবং বৌদ্ধ যুগের পূর্বে বাগ্‌ভট আবির্ভূত হয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার তাঁকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত করেছেন।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহে আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গই সংগৃহীত হয়েছে। বাগ্‌ভট নিজে কিন্তু তাঁর এই গ্রন্থকে কায়চিকিৎসার গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন—"সংগৃহীতং বিশেষেণ যত্র কায়চিকিৎসিতম্"। গ্রন্থটি ছয়টি স্থানে বিভক্ত—সূত্রস্থান, শরীরস্থান, নিদানস্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান এবং উত্তরস্থান। সূত্রস্থানে সূত্রাকারে আয়ুর্বেদের পালনীয় কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে। শরীরস্থানে শারীরের ধর্মবিভাগ, শিরা-ধমনী প্রভৃতির বিভাগ ও কার্যকারিতা, মরণজ্ঞাপক রিষ্টলক্ষণ, গর্ভব্যাকরণ প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা আছে। নিদানস্থানে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন লক্ষণ বা উপসর্গ। সকল রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি, পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়েছে চিকিৎসাস্থানে। কল্পস্থানের প্রতিপাদ্য বিষয় হল পঞ্চ কর্ম চিকিৎসাবিধি। উত্তরস্থানে আছে শিশুরোগ চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, অস্থিভঙ্গাদির চিকিৎসা, বিষচিকিৎসা প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ।

'অষ্টাঙ্গহৃদয়' বাগ্‌ভট প্রণীত দ্বিতীয় গ্রন্থ। অষ্টাঙ্গসংগ্রহ অপেক্ষা এর রচনাশৈলী অনেক প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। হৃদয় যেমন শরীরের একদেশ হয়েও দশটি প্রধান শিরার দ্বারা সকল শরীরে ব্যাপ্ত, অষ্টাঙ্গহৃদয় গ্রন্থটিও তেমনি সূত্র, শরীর, নিদান, চিকিৎসা, কল্প ও উত্তর—এই ছয়টি স্থান দ্বারা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদে পরিব্যাপ্ত —"হৃদয়মিব হৃদয়মেতৎ সর্বায়ুর্বেদবাঙ্ময়পয়োধেঃ"। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সকল স্থানই উৎকৃষ্ট, বিশেষ করে সূত্রস্থান তো সর্বাতিশায়ী উৎকর্ষের নিদর্শন—'নিদানে মাধবঃ শ্রেষ্ঠঃ সূত্রস্থানে চ বাগ্‌ভটঃ"। জ্বরাতিসার, শিশুচিকিৎসা, শল্যতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র প্রভৃতির আলোচনা অনেক সমৃদ্ধ।

'রসরত্নসমুচ্চয়' গ্রন্থে রসায়ন ঔষধের সেবনবিধি বর্ণিত হয়েছে। বাগ্‌ভটের মতে যথাসময়ে রসায়ন ঔষধি সেবনে সুফল পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে মোট ত্রিশটি অধ্যায় আছে। চতুর্দশ ও পঞ্চ দশ অধ্যায়ে যথাক্রমে রাজযক্ষা এবং অর্শ রোগের চিকিৎসার

বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

মাধবকরের রুগ্‌বিনিশ্চয়

বাগ্‌ভটের পরবর্তী অপর উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদাচার্য হলেন মাধব কর। তিনি শিলাহ্রদ নিবাসী ইন্দু করের পুত্র। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী মাধবের স্থিতিকাল। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ইতিহাসে তিনজন মাধবের নাম পাওয়া যায় 'রুগ্‌বিনিশ্চয়কর্তা মাধবের 'কর' পদবী দেখে অনেকে তাঁকে বাঙালী বলে অনুমান করেন। মাধবের 'রুগ্‌বিনিশ্চয়' রচিত হয় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষার্ধে। গ্রন্থটি 'নিদান' নামেই অধিকতর প্রসিদ্ধ। গ্রন্থটিতে প্রতি রোগের পাঁচটি নিদান কথিত হয়েছে। মাধবের মতে প্রত্যেক রোগোৎপত্তির পাঁচটি স্তরভেদ আছে—নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয় এবং সম্প্রাপ্তি। যার দ্বারা রোগের উৎপত্তি হয় তাকে বলা হয় নিদান। রোগ হওয়ার পূর্বে রোগের কতিপয় লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এটাই পূর্বরূপ। রোগ হলে যে লক্ষণ দ্বারা রোগের স্বরূপ নির্দিষ্টরূপে জানা যায় তার নাম রূপ। যার দ্বারা রোগের উপশম হয় তাকে বলা হয় উপশয়। বায়ু, পিত্তাদি দোষ কুপিত হয়ে যেভাবে রোগ উৎপাদন করে তার আনুপূর্বিক বিবরণকে বলা হয় সম্প্রাপ্তি। রোগের এই পঞ্চ নিদান সম্পর্কে মাধব বলেছেন—

"নিদানং পূর্বরূপাণি রূপান্যুপশয়স্তথা।
সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগানাং পঞ্চ ধা স্মৃতম্।।"

আজ থেকে প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে নিদানপঞ্চকের স্বরূপ বর্ণনা করে মাধব আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রুগ্‌বিনিশ্চয় গ্রন্থে রোগের কারণগুলি কেবল নিরূপিত হয় নি, রোগের অরিষ্ট লক্ষণসমূহও অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের লক্ষণগুলিও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

মাধবের নামাঙ্কিত অপর একটি গ্রন্থের নাম 'চিকিৎসা'। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি এখানে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও খাদ্যাখাদ্য ও পরিপাক বিষয়ক 'কূটমুদ্গর', 'পর্যায়রত্নমালা', 'আয়ুর্বেদরসশাস্ত্র', 'আয়ুর্বেদপ্রকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থও মাধবের নামের সঙ্গে যুক্ত। তবে এই মাধব ও মাধব কর একই ব্যক্তি কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। সুশ্রুতসংহিতার উপর মাধবের 'সুশ্রুতশ্লোকবার্তিক' নামক একখানি টীকা পাওয়া যায়।

চক্রপাণি দত্তের চিকিৎসাসারসংগ্রহ

আত্রেয় সম্প্রদায়ের অপর উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম 'চিকিৎসাসারসংগ্রহ'। এর রচয়িতা চক্রপাণি দত্ত বাঙালী ছিলেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি এভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন—

"গৌরাধিনাথরসবত্যধিকারিপাত্র-
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োত্তরঙ্গাৎ।

ভানোরনু প্রথিতলোধ্রবলীকুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারী।।"

এর থেকে জানা যায় যে, চক্রপাণির পিতার নাম নারায়ণ এবং অগ্রজের নাম ভানু। নারায়ণ ছিলেন গৌড়েশ্বর নরপালের কর্মচারী এবং রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক (রসবত্যধিকারী)। চক্রপাণি লোধ্রবলী বংশীয় কুলীন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে নয়পাল গৌড়ের শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং ঐ সময়েই চক্রপাণি তাঁর এই গ্রন্থ রচনা করেন।

'চিকিৎসাসারসংগ্রহ' গ্রন্থে রোগনির্দ্ধারণ ও ধাতবদ্রব্যের গুণাগুণ আলোচিত হয়েছে। এটি আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি ছাড়াও চক্রপাণি দত্ত চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতার টীকা রচনা করেছিলেন। টীকা দু'টির নাম যথাক্রমে 'আয়ুর্বেদদীপিকা' এবং 'ভানুমতী'। 'শব্দচন্দ্রিকা' এবং 'দ্রব্যগুণসংগ্রহ' নামক গ্রন্থদ্বয়ও চক্রপাণির লেখনীপ্রসূত। 'শব্দচন্দ্রিকা' হল আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অভিধান। 'দ্রব্যগুণসংগ্রহে' আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন গাছ-গাছড়া, পারদ প্রভৃতি ধাতুর গুণাগুণ ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা।

ভাবপ্রকাশ

বাগ্‌ভটের পর আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অনেক সংগ্রহগ্রন্থ রচিত হলেও কোন গ্রন্থেই সম্পূর্ণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের সংগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে ভাবমিশ্র 'ভাবপ্রকাশ' নামক গ্রন্থে অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ করেন। শুধু তাই নয়, বাগ্‌ভটের পর বিগত সহস্রাধিক বৎসরের মধ্যে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদে যে সকল নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছিল সেগুলিও এই গ্রন্থে যথাযথ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। রসোপরস, নানান ধাতু, অহিফেন, সোহারা প্রভৃতি দ্রব্যের রোগ প্রতিষেধ ক্ষমতা যেমন এখানে আলোচিত হয়েছে, তেমনি নানা প্রকার নতুন রোগের কথাও লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বৈদ্যজীবন

ভাবমিশ্রের তিরোধানের পর প্রায় তিনশত বছরকে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের বন্ধ্যাযুগ নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ এই সময়ের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয় নি। লোলিম্বরাজ 'বৈদ্যজীবন' নানক গ্রন্থ রচনা করলেও তাতে চিকিৎসা-ব্যবস্থা অপেক্ষা কাব্যকলার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থকার রোগীদের কিরূপ পরামর্শ দিয়েছেন তার একটি শ্লোক উল্লেখ করলে বোঝা যায় যে, লোলিম্বরাজ কাব্য রচনাতেই অধিক সিদ্ধহস্ত ছিলেন—

"পিত্তজ্বরে কিং রসফাল্টো লেপৈঃ
কিংবা কষায়ৈরমৃতেন কিং বা।
প্রেয়ং প্রিয়ায়া মুখমেকমেব
লোলিম্বরাজেন সদানুভূতম্।।"